বাবরী মসজিদ ট্র্যাজেডি

কেউ কি আছে এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার?

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

বাবরী মসজিদ ট্র্যাজেডি

কেউ কি আছে এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার?

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

প্রকাশনা

সূচিপত্র

ভূমিকা

সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও বোনেরা! মুহতারাম উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ'র 'বাবরী মসজিদ ট্র্যাজেডি: কেউ কি আছে এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার?' নামক গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা পুস্তিকা আকারে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ এই লেখায় লেখক বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী দলগুলোর পরিকল্পনা, একতা, সমর্থনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদীদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ হবার বিষয়টি রাসুলুল্লাহর হাদিস থেকে প্রমাণিত। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে চূড়ান্ত অবস্থার দিকেই যাচ্ছে। কিন্তু মুসলিমরা আজও বেখবর।

অবস্থার পরিবর্তনে প্রথমত প্রকৃত শত্রু, শত্রুর বিদ্বেষের কারণ স্পষ্ট হওয়া জরুরী। উপমহাদেশের মুসলিমদের শত্রু কারা? বিজেপি, কংগ্রেস, ভারতের সেক্যুলার সংবিধান, সেক্যুলার আদালত, সেক্যুলার সামরিক বাহিনী, পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী সরকার, গাদ্দার সেনাবাহিনী, বাংলাদেশে ভারতের এজেন্ট সরকার ও তার বাহিনী, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ইসরাইল, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, মানবাধিকার সংস্থা, জাতিসংঘ – এদের মধ্যে কে মুসলিমদের ভাল চায়?

প্রকৃত বাস্তবতা হল – মুসলিম নিধন ও অত্যাচারের ক্ষেত্রে এরা সবাই একজোট। কেউ সরাসরি, কেউবা সমর্থন দিয়ে। লেখক এই বিষয়টিই সংক্ষেপে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রবন্ধে পাঠক ও পাঠিকাগণ নিজেদের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনাও পাবেন ইনশা আল্লাহ।

এই লেখাটির উর্দু সংস্করণ ইতিপূর্বে 'জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখা'র অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন 'নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' এর গত নভেম্বর - ডিসেম্বর ২০২১ ইংরেজি সংখ্যায় "সানেহায়ে বাবরী মসজিদ: কুওঈ হ্যায় জো ইস সে ইবরত হাসিল কারে?" (سانحۂ بابری مسجد: کوئی ہے جو اس سے عبرت حاصل کرے!؟) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই লেখাটির মূল বাংলা সংস্করণটি লেখক আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, যা এখন পুস্তিকা আকারে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। আলহামদু লিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ।

আম-খাস সকল মুসলিম ভাইদের ও বোনদের জন্য এই রিসালাহটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হল- লেখাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়েদা ব্যাপক করুন! আমীন।

সম্পাদক

২৮ শে জুমাদাল উলা, ১৪৪৩ হিজরি

২রা জানুয়ারি, ২০২২ ইংরেজি

বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা হয় প্রায় তিন দশক আগে। বস্তুত এ ঘটনা ছিল উপমহাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন পর্যায়ের সূচনার চিহ্ন। প্রায় সাড়ে চারশো বছরের ঐতিহ্যবাহী মসজিদকে দিনেদুপুরে ভেঙ্গে ফেলার মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী শক্তি সদর্পে উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের পুনরুত্থানের ঘোষণা দেয়। সেই থেকে ক্রমাগত এই শত্রু শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সাথে নিজ প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য উপমহাদেশকে রামরাজ্যে পরিণত করা। মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন, বিতাড়িত অথবা সম্পূর্ণভাবে পদানত করা।

সম্প্রতি হিন্দু মহাসভার নেতাদের পক্ষ থেকে মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদে কৃষ্ণের মূর্তি রাখার হুমকি থেকে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের রেশ আবারো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এই হিন্দু মহাসভার লোকেরাই ১৯৪৯ সালে রাতের অন্ধকারে বাবরী মসজিদের ভিতরে কৃষ্ণ মূর্তি রেখে আসে। এই জঘন্য অপরাধের মাধ্যমেই বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া পূর্ণতায় পৌছায় ১৯৯২ এর ৬ই ডিসেম্বর। কিন্তু লক্ষ্য করুন, ১৯৪৯ এ রাতের অন্ধকারে যা করা হয়েছিল, ২০২১ এ তা প্রকাশ্যে করার কথা বলা হচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যায়, পরিস্থিতি কিভাবে অগ্রসর হয়েছে।

দুঃখজনক-ভাবে উপমহাদেশের মুসলিম, মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং উলামায়ে কেরামগণ এ বাস্তবতাকে আজও বুঝে উঠতে পারছেন না। কিন্তু অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না। শত্রু তার কাজ করে যাচ্ছে, যদিও আমরা বেখবর।

এ প্রবন্ধে আমাদের চেষ্টা থাকবে সংক্ষেপে বাবরী মসজিদ ধংসের পিছনের মূল শক্তির পরিচয়, তাদের পরিকল্পনা এবং উপমহাদেশের মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরার।

হিন্দুত্ববাদ:

বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে রামমন্দির নির্মাণের প্রকল্পে প্রধান ভূমিকা পালন করে ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তি। হিন্দুত্ববাদীরাই প্রথমে বাবরী মসজিদের নিচে কল্পিত

রামমন্দির থাকার স্লোগান তুলে। হিন্দুত্ববাদীরাই ১৯৪৯ সালে মসজিদের ভিতর রামের মূর্তি রাখে। তাদের উদ্যোগেই 'রাম-জন্মভূমি আন্দোলন' গড়ে উঠে। রথযাত্রা শুরু হয়, এবং ১৯৯২ সালে মসজিদ ধ্বংস করা হয়।

হিন্দুত্ববাদ একটি আদর্শিক আন্দোলন। এদের তুলনা করা চলে ইসরায়েলের জায়নবাদীদের সাথে। আরএসএস এর হিন্দুত্ববাদীরা খোলাখুলি ইসরায়েলের অনুকরণ করার কথা বলে।

এই আদর্শিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি দীর্ঘ। আমরা অনেক সময় শুধু বিজেপি কিংবা আরএসএস এর কথা বলি। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের মধ্যে আসলে বিভিন্ন ধারা এবং উপধারা রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান দুটি ধারা হল অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (সংক্ষেপে RSS) কে।

হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৫ তে। বিনায়ক দামোদর সাভারকরসহ অন্যান্য কিছু হিন্দু নেতা ছিল এর প্রতিষ্ঠাতা। আরএসএস প্রতিষ্ঠিত হয় দশ বছর পর, ১৯২৫ সালে। প্রথমদিকে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রধান সংগঠন ছিল হিন্দু মহাসভা। আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতির দিক থেকে হিন্দু মহাসভা তুলনামূলকভাবে বেশি উগ্র। এই সংগঠনের পরিকল্পনাতেই গান্ধীকে হত্যা করা হয়। বাবরী মসজিদের ভিতর রামমূর্তিও রাখা হয় হিন্দু মহাসভার পরিকল্পনা অনুযায়ী।

কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যাপ্তি ও প্রভাবের দিক থেকে হিন্দু মহাসভাকে ছাড়িয়ে যায় আরএসএস। বর্তমানে আরএসএস এক বিশাল হিন্দুত্ববাদী নেটওয়ার্কের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। যার আছে প্রায় ৫৭ হাজার শাখা এবং ৬০ লক্ষ সদস্য। এছাড়া আরএসএস পরিবারের অংশ হিসাবে আছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দলসহ বিভিন্ন সংগঠন। আরএসএস এর সাথে যুক্ত ভারতের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপিও। যদিও কাগজেকলমে তারা আলাদা সংগঠন। ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির মূল সমর্থন ও আকর্ষণের ভিত্তি হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প। বিজেপির রাজনৈতিক উত্থানের পিছনে হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিল পশ্চিমবঙ্গের শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি। ১৯৪৭ সালে নেহরু তাকে মন্ত্রী বানায়। কিন্তু মুসলিমদের প্রতি কংগ্রেসের 'নরম' নীতি পছন্দ না হওয়াতে ১৯৫১ সালে 'ভারতীয় জন সংঘ' নামে নতুন দল গঠন করে সে। কিন্তু এই দল ভারতীয় রাজনীতিতে শক্তিশালী দল হয়ে উঠতে পারেনি।

রাজনীতির মূলমঞ্চে একক শক্তিশালী দল হিসাবে হিন্দুত্ববাদীদের আবির্ভাব ঘটে বিজেপির মাধ্যমে।

১৯৭৭ সালে ভারতীয় জন সংঘ ভেঙ্গে তৈরি 'জনতা পার্টি'। ১৯৮০ সালে দলটি আবার ভাঙ্গে। এসময়ই গঠিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি মাত্র ২টি সিট পায়। কিন্তু ১৯৯১ এ পায় ১২০ টি সিট। ৭ বছরের মধ্যে ২ থেকে ১২০! এই চমকপ্রদ উত্থানের পিছনে মূল কারণ ছিল 'রাম-জন্মভূমি আন্দোলন' এবং 'রথযাত্রা কর্মসূচী'। এই দুই কর্মসূচীর মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতির বহিঃসীমান্ত থেকে মূলধারার প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের একটিতে পরিণত হয় বিজেপি। শুরু হয় ভারতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উত্থানের এক নতুন যুগ। এই দুই কর্মসূচীই ছিল সরাসরি বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের সাথে সরাসরি যুক্ত।

তবে বিজেপি ও আরএসএস বাহ্যিক চেহারা হলেও হিন্দু মহাসভা এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোট উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলোর ভূমিকাও হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের জন্য অত্যন্ত জরুরী। বাবরী মসজিদের ঘটনা থেকে এটি স্পষ্ট বুঝা যায়।

১৯৪৯ এ মসজিদে মূর্তি স্থাপনের কাজ শুরু হয় বিশ্ব হিন্দু মহাসভার মাধ্যমে। ১৯৮৩ সালে রামজন্মভূমি আন্দোলনেরও সূচনা করে সঙ্ঘ পরিবারের তুলনামূলক সবচেয়ে উগ্র সদস্যদের একটি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই ১৯৬৪তে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি শুরু থেকেই মাঠপর্যায়ের সাধুদের (উগ্র হিন্দু পণ্ডিত) ইসলামীবিরোধী মনোভাবকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শুরু করা রামজন্মভূমি আন্দোলনকে সুযোগ বুঝে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসে বিজেপি। বিজেপির লাল কৃষ্ণ আদভানি বাবরী মসজিদকে উপস্থাপন করে হিন্দুদের পরাজয়ের প্রতীক হিসাবে। আর বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে রামমন্দির নির্মাণকে তুলে ধরে হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে।

শুরু থেকেই হিন্দুত্ববাদের আদর্শের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হল এমন এক রাষ্ট্র বানানো যা হবে কেবল হিন্দুদের জন্য। হিন্দুরা ছাড়া অন্যেরা অল্প সংখ্যায় এতে থাকতে পারে তবে তাদের থাকতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে। তাই হিন্দুত্ববাদীরা মনে করে মুসলিমদের হিন্দুস্তানে থাকার অধিকার নেই, আর একান্তই যদি থাকতে হয় তাহলে তারা থাকবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে।

বর্তমানে বিজেপি যে সব আইন তৈরি করছে বা পদক্ষেপ নিচ্ছে তার সবই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির অংশ।

যেমন শ্যামাপ্রসাদের ভারতীয় জন সংঘ ১৯৫৩ সালেই জম্মু-কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিলের জন্য ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা তুলে দেয়ার দাবি তুলেছিল। ৬০ এর দশকের শেষ দিকে তারা গরু জবাই নিষিদ্ধের দাবি তুলে। একইভাবে তারা দাবি তুলে সারা ভারতের জন্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড তৈরিরও। এর কিছু কিছু ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে, বাকিগুলো বাস্তবায়নের কাজ চলছে। ৩৭০ ধারা বাতিল, গরু জবাই নিয়ে আগ্রাসন, ইউনিফর্ম সিভিল কোড (uniform civil code), নাগরিকত্ব সংশোধন আইন, এনআরসি এগুলো সবই ভারতকে একটি "হিন্দু রাষ্ট্র" বানানোর অংশ।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো প্রায় একশো বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে ধৈর্য, অধ্যবসায় ও কৌশলের সাথে। রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়গুলো কিছুটা আড়াল করলেও মূল লক্ষ্য থেকে তারা কখনো চোখ সরায়নি। সুযোগ পাওয়া মাত্রই আবার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর এই প্রকল্পের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল বাবরী মসজিদের ধ্বংস।

সেক্যুলার ইন্ডিয়া:

তবে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা এবং রামমন্দির নির্মাণ প্রকল্পে কেবল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর সমর্থন ছিল না। এতে সেক্যুলার নামধারী কংগ্রেস এবং ভারতীয় আদালতেরও ভূমিকা আছে। কংগ্রেস সরকারই মসজিদের ভিতর রামমূর্তি রাখার সাথে বিশ্ব হিন্দু সভা এবং আরএসএস এর সম্পৃক্ততার কথা ধামাচাপা দেয়। কংগ্রেসের একটি অংশ পর্দার আড়াল থেকে তাদের সমর্থনও দেয়। ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধীর সিদ্ধান্তে বাবরী মসজিদ প্রাঙ্গণ হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিল কংগ্রেসের নরসিংহ রাও। সে হিন্দুত্ববাদীর প্রতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মসজিদ ভাঙ্গার প্রস্তুতি চলছে, এটি জানা সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকার নির্বিঘ্নে এ কাজ এগিয়ে চলতে দেয়।

এছাড়া ১৯৪৯ থেকে শুরু করে বারবার ভারতীয় সেক্যুলার আদালত হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষ নিয়েছে। হিন্দুত্ববাদীদের দাবিগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে কোর্টের রায়ের মাধ্যমে। বস্তুত সেক্যুলার কংগ্রেস, এবং সেক্যুলার আদালতের সহায়তা ছাড়া হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প আজ এ অবস্থায় আসতে পারতো না।

দুঃখজনক বাস্তবতা:

ইতিহাস থেকে স্পষ্ট যে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে রামমন্দির নির্মাণ কোন একটি দলের প্রকল্প নয়। ভারতীয় হিন্দু দল ও নেতাদের বড় একটি অংশ সরাসরি এর সাথে যুক্ত। বাকিরা সমর্থক। কিন্তু দুঃখজনকভাবে উপমহাদেশের মুসলিমদের বিশাল একটি অংশ এই বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। হিন্দুত্ববাদী এই প্রকল্প মুসলিমের জন্য কতোটা বিপজ্জনক, তা অনুধাবনের ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক ব্যর্থতা। আফসোসের সাথে বলতে হয়, গতানুগতিক রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে ইসলামী দল এবং উলামায়ে কেরামও এই হুমকিকে সঠিকভাবে চিনতে পারছেন না।

বিশেষ করে ভারতের মুসলিমদের বিশাল একটি অংশ এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা আলিমদের বড় একটি অংশ এখনো মনে করছেন ‘সেক্যুলার ভারত’ মুসলিমদের রক্ষা করবে। তারা কেন যেন ভুলে যাচ্ছেন সেক্যুলার ভারতের সেক্যুলার সংবিধান, সেক্যুলার আদালত, সেক্যুলার প্রতিষ্ঠান এবং সেক্যুলার বাহিনীগুলোর মাধ্যমেই বারবার মুসলিমদের আক্রান্ত হবার ইতিহাস রয়েছে। ‘সেক্যুলার ভারত’ই মুসলিমদের কাশ্মীরকে গলা চেপে হত্যা করছে।

অন্যদিকে পাকিস্তানের মুসলিমরা আজও এমন এক শাসকগোষ্ঠী এবং সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য নুসরতের আশা নিয়ে বসে আছেন যারা শুরু থেকে কেবল মুসলিমদের রক্তই ঝরিয়ে গেছে। আর হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন আর ভারতীয় এজেন্টদের জুলুমের শিকার হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুসলিমরা এখনো নির্বাচন আর গণতন্ত্রের মধ্যে সমাধানের নিষ্ফল স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে।

আমরা বিশ্বাস করি ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো থেকে শুরু করে উপরোক্ত উলামায়ে কেরাম, সকলেই আন্তরিকভাবে দ্বীন ইসলাম এবং উম্মতে মুসলিমার কল্যাণ চান। কিন্তু তারা আজও এমন কিছু কাঠামোর ভিতরে চিন্তা করছেন যেগুলো অনেক আগেই অকার্যকর প্রমাণিত হয়ে গেছে। উপমহাদেশে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা এ অঞ্চলের মুসলিমদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। বিদ্যমান শাসকগোষ্ঠীগুলো মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহী নয়। বরং তারা আগ্রাসনকারীদের দলভুক্ত। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই বাস্তবতাগুলো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই কথাগুলো ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ – সবগুলো জনপদের জন্যই সত্য।

৭০ বছরের বেশি সময় ধরে গণতন্ত্র, সেক্যুলার সংবিধান, জাতীয়তাবাদী সীমানা আর 'রাষ্ট্রের নিয়ম' মেনে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার, ঈমান ও ইজ্জত রক্ষার এবং ইসলামী শরীয়াহ কায়েমের স্বপ্ন দেখা হয়েছে। এর ফলাফল আমাদের সামনে পরিষ্কার। স্বপ্ন আজ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। আর কতকাল গেলে এই পথের অর্থহীনতা স্পষ্ট হবে?

আমরা কি মনে করছি আমাদের সামনে কোন বিপদ নেই? যেখানে হিন্দুত্ববাদীদের প্রকল্প প্রকাশ্য ও ঘোষিত?

নাকি আমরা মনে করছি, বিদ্যমান ব্যবস্থা কোন না কোন ভাবে আমাদের রক্ষা করবে? আমাদের মা-বোনদের হেফাজত করবে?

আমরা কি আজও সেক্যুলার সংবিধান, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, মানবাধিকার সংস্থা কিংবা জাতিসংঘের উপর ভরসা করে রইবো?

বসনিয়াতে কিংবা মিয়ানমারে গণহত্যার সময় কেউ কি এগিয়ে এসেছে মুসলিমদের রক্ষায়? গত দশ বছর ধরে বিলাদুশ শামে আহলুস সুন্নাহর উপর হত্যা চালানো হয়েছে নির্মমভাবে। ধর্ষণ, নির্যাতন, কেমিক্যাল অস্ত্র, ব্যারেল বোমা – বাদ যায়নি কিছুই। তারপরও কি এগিয়ে এসেছে কেউ? মিশরে একদিনে গুলি চালিয়ে ১৪০০ মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। কেউ কি কিছু বলেছে? ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে জায়নবাদীরা আমাদের হত্যা করে আসছে। কেউ কি কিছু করেছে?

সংবিধান, জাতিসঙ্ঘ, মানবাধিকার সংস্থা, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় – কোন কিছুই কি মুসলিমদের কাজে এসেছে?

আর কতো উদাহরণ দরকার আমাদের?

চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধে (new cold war) এই অঞ্চলে ভারত আমেরিকার প্রধান মিত্র। ইসরায়েলের সাথেও আছে ভারতের নিবিড় সম্পর্ক। কাশ্মীরে ভারতীয় আগ্রাসন চলছে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আগ্রাসনের অনুকরণে। আবার ভারতের সম্পর্ক আছে রাশিয়ার সাথেও। সিরিয়ার মতো দেশের সরকারকেই যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাঁধা না দেয় তাহলে কোন যুক্তিকে আমরা আশা করি যে ভারতকে কেউ আটকাবে? কোন যুক্তিতে মনে করা যায় যে হিন্দুত্ববাদের সর্বনাশা প্রকল্পে কেউ বাঁধা দেবে?

উপসংহার:

বাস্তবতা হল, মুসলিমের রক্ষায় কেউ এগিয়ে আসবে না। যেভাবে আগেও কেউ আসেনি। কোন দেশের সংবিধান কিংবা আদালত মুসলিমদের নিরাপত্তা দিবে না। এভাবে আগেও দেয়নি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মুসলিমদের জন্য কাঁদবে না, যেভাবে আগেও কাঁদেনি। কাশ্মীর ও আসামে কী হচ্ছে, কী হয়েছে তা দুনিয়ার সামনেই আছে। দাঙ্গার নামে দিল্লিতে কী হয়েছে পৃথিবী দেখেছে। কিন্তু কেউ আসেনি। কেউ আসবেও না।

হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প তার নিজের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এক শতাব্দী ধরে চলা প্রস্তুতিকে তারা এখন কাজে রূপান্তরিত করছে। ছোট ঢেউ সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে সুনামির আকার নিয়েছে। এই ঢেউ এখন এগিয়ে আসছে উপমহাদেশের, বিশেষ করে ভারতের মুসলিমদের দিকে। তাদের গ্রাস করার জন্য। এই সুনামি ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী সীমান্ত মেনে চলবে না। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে পুরো অঞ্চলে জুড়ে।

বিদ্যমান কাঠামোর ভিতরে আমাদের জন্য কোন সমাধান নেই। আছে শুধু হত্যা, নির্যাতন আর অপমান। ব্রিটিশদের আগমনের মাধ্যমে অপমান ও পরাজয়ের যে

অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল সে অধ্যায় আজও চলছে। ব্রিটিশরা চলে গেলেও তাদের রেখে যাওয়া ব্যবস্থা আমাদেরকে সেই একই খাঁচায় আটকে রেখেছে।

তাই উপমহাদেশের মুসলিমদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে। বাস্তবতাকে বুঝতে হবে। ছেলেভুলানো আশ্বাস দিয়ে আর কাজ চলবে না। কোন সরকার, সেনাবাহিনী কিংবা প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। প্রতিরোধ গড়তে হলে, উঠে দাড়াতে হবে মুসলিমদেরই।

অস্তিত্ব টিকাতে হলে, হারানো গৌরব ও সম্মান ফিরে পেতে হলে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর কোন বিকল্প উপমহাদেশের মুসলিমদের সামনে নেই। আর এই জিহাদ হতে হবে ঈমানের প্রতিরক্ষা এবং ইসলামী শরীয়াহ কায়েমের লক্ষ্যে। কোন রাষ্ট্রের স্বার্থে না। ভারতের মুসলিমদের 'সেক্যুলার ইন্ডিয়ার' মিথ্যা প্রতিশ্রুতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। প্রস্তুত হতে হবে আত্মরক্ষার জন্য। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুসলিমদের চিন্তা করতে হবে তারা কি জাতীয়তাবাদী সীমান্তের ভিতরে নিজেদের ঈমানকে আটকে রাখবে? নাকি মহান আল্লাহর শরীয়াহ অনুযায়ী নিজের করনীয় নির্ধারণ করবে।

আমাদের সামনে এক কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। ভুল বুঝার অবকাশ নেই। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর পথ, ইসলামী শরীয়াহ কায়েমের সফর –পথ সহজ হবে না। এ পথ দীর্ঘ, বন্ধুর, রক্তাক্ত। কিন্তু এটিই একমাত্র পথ যার শেষ প্রান্তে রয়েছে সম্মান, মর্যাদা আর বিজয়। অন্য সব পথ আমাদের নিয়ে যাবে লাঞ্ছনা, অপমান আর ধ্বংসে। বাবরী মসজিদ এই শিক্ষা আমাদের সামনে রেখে গেছে।

****